ইউনিট
২

ব্যবসায় ও বিপণন কৌশল
Business and Marketing Strategy

বর্তমান বিশ্বায়নের ফলে ব্যবসায় জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্রেতার রুচির পরিবর্তন, কম্পিউটারের আবিষ্কার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ইউটিউব ও ডিশ-এন্টেনার ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বিপণন যেমন সুযোগ সৃষ্টি করছে, অপরদিকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হচ্ছে। কারণ তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত পণ্য বিপণন বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। বিজ্ঞাপনের প্রভাবে ক্রেতারা প্ররোচিত হয়ে কতিপয় পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু মানসম্পন্ন পণ্যের উৎপাদকগণ বাজারে টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। তাই ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিপণন কৌশলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ সুপরিকল্পিত কৌশল ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনের সহায়ক।

এই ইউনিটে মোট ছয়টি পাঠ আছে। প্রথম পাঠে কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে ব্যবসায় কৌশল ও বিপণন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাঠে কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপ ও বিবেচ্য উপাদানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ণের পদক্ষেপসমূহ ও ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম পাঠে বাজারে অবস্থান গ্রহণের কৌশলসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ পাঠে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১: কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উপাদানসমূহ
পাঠ-২.২: ব্যবসায় কৌশল ও বিপণন কৌশলের উপাদানসমূহ
পাঠ-২.৩: কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপ ও বিবেচ্য উপাদানসমূহ
পাঠ-২.৪: কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ণের ধাপ ও ইহার গুরুত্ব
পাঠ-২.৫: বাজারে অবস্থান গ্রহণের সংজ্ঞা ও বাজারে অবস্থান গ্রহণের কৌশলসমূহ
পাঠ-২.৬: কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পাঠ-২.১ কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ
Concepts, Characteristics and Components of Corporate Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কর্পোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন
- প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের ধারণা
Concepts of Corporate Strategy

ক্রেতার পরিবর্তিত রুচি ও চাহিদা, দ্রুত হারে প্রযুক্তির পরিবর্তন, ব্যাপক বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় জগতে একদিকে যেমন সুযোগ সৃষ্টি হযেছে,অন্যদিকে তেমনি ব্যাপক চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি হয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়ত কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও এসব চ্যালেঞ্জ মোকবেলা সহজ কাজ নয়। কৌশল হলো পরিবর্হিত পরিস্থিতিতে বা হঠাৎ কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার উদ্ভব হলে তা মোকাবেলা করার পরিকল্পিত কর্মপন্থা। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন-

অনুরাধা নামক একটি সেলুনে গ্রাহকের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেল। প্রতিদিন কয়েকজন করে সেবা গ্রাহক বেশি আসায় সেলুনের মালিক সুকুমার বাবু বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক সেবা গ্রাহকের চাপ কুলাতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায়, একদিন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক জনাব রকিবউজ্জামান তার সেলুনে সেবা নিতে এলে সুকুমার এ বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। জনাব রকিব তাকে ঐ সেলুনে কয়েকটি অতিরিক্ত সীটের ব্যবস্থা করে কাস্টমারদের জন্য 'ফ্রি ওয়াই ফাই' এর সংযোগ এবং একটি 'ম্যাগাজিন' এর ব্যবস্থা করতে বলেন। যাতে সেলুনে আসা গ্রাহকরা সিরিয়ালের জন্য অপেক্ষার সময়টুকু বন্ধুদের সাথে চ্যাটিং করে অথবা ম্যাগাজিন পড়ে কাটিয়ে দিতে পারেন। জনাব রকিবের পরামর্শ মতো কাজ করায় অনুরাধা সেলুনের সিরিয়াল নিয়ে সমস্যার সমাধান হয়। সেলুনে আসা কাস্টমাররা এখন আর সিরিয়াল নিয়ে আগের মতো হট্টগোল করে না। কাজেই বলা যায়, কৌশল হলো ব্যবসায় সহায়ক একটি পন্থা।

বিপণন প্রক্রিয়া পণ্য উৎপাদনের পূর্ব থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকে। বিপণনের কাজকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা-পণ্য উৎপাদনের পূর্বের কাজ, উৎপাদনের পরের কাজ এবং পণ্য বিক্রয় পরবর্তী কাজ। পণ্য উৎপাদনের পূর্বে বিপণনের কাজগুলো হচ্ছে- বাজার জরিপ, চাহিদা নির্ধারণ, অর্থ-সংস্থান, প্রতিযোগীদের চিহ্নিত করা ইত্যাদি। উৎপাদনের পরে বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-পণ্যের মান নির্ধারণ, বিভক্তিকরণ, মোড়কীকরণ, মূল্য নির্ধারণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বণ্টন, ঝুঁকি গ্রহণ, পণ্য প্রসার ইত্যাদি। সর্বশেষে পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া অথবা বিক্রয় করা হলেই বিপণনের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় না। ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর পরও বিপণনের কিছু কাজ থাকে। যেমন- বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান, ভোক্তা বা ক্রেতার সন্তুষ্টি পরিমাপ, সন্তুষ্টি বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করা এবং বিপণনের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যে, বিপণন হচ্ছে একটি সামাজিক ও ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ক্রেতাদের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য ও সেবা তৈরি ও বিনিময় করার মাধ্যমে প্রয়োজন ও অভাব মিটিয়ে তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। আর এ জটিল প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতিনিয়ত কৌশলের পরিবর্তন করে

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায় ও বিপণনের এ কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক কৌশলের সংজ্ঞা

Definition of Corporate Strategy

ক্রেতা বা ভোক্তার পরিবর্তিত প্রয়োজন, অভাব ও চাহিদা, দ্রুত প্রযুক্তির পরিবর্তন, বিশ্বব্যাপী বিপণনের ব্যাপক প্রসার, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, সরকারি নানা বিধি-নিষেধ, পরিবেশবাদীদের মোকাবেলা ইত্যাদি নানা কারণে ব্যবসায় জগত আজ বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ফলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

সাধারণত অর্থে, কোম্পানিকে র উচ্চতর ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে কর্পোরেট বা প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বলে। আর সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কোম্পানিকে র উচ্চতর ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত এসব কৌশলই হলো কর্পোরেট কৌশল বা প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক Cravens & Piercy বলেন, “Corporate strategy is the way a company creates value through the configuration and coordination of its multimarket activities.” অর্থাৎ কর্পোরেট কৌশল হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানী তার বহু বাজার কার্যক্রমের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে।

Michael E. Porter এর মতে, “Corporate strategy is what makes the corporate whole add up to more than the sum of its business unit parts.” অর্থাৎ ব্যবসায় কার্যক্রম সংগঠনের জন্য সতন্ত্র কতকগুলো কৌশলের সমন্বিত রূপই হলো প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে কর্পোরেট বা প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হলো-

- ✓ কর্পোরেট কৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়
- ✓ ইহা সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়
- ✓ কর্পোরেট কৌশল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হতে পারে
- ✓ ইহা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভ্যালু সৃষ্টির সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানিকে র সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীকে কর্পোরেট কৌশল বলে।

কর্পোরেট কৌশলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

Characteristics of Corporate Strategy

প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সাধারণত যে দীর্ঘমেয়াদীকৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল (Corporate Strategy) বলে। কর্পোরেট কৌশল সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী হয় বিধায় এর মাধ্যমে কাঙ্খিত সময়ব্যাপী সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে কর্পোরেট কৌশল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। নিম্নে কর্পোরেট কৌশলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. **শীর্ষ ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রণীত (Developed by Top Management)** ঃ কর্পোরেট কৌশল সাধারণত দীর্ঘমেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হয়। কাজেই কর্পোরেট কৌশলের নির্দেশনাগুলো শীর্ষ ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রণীত হতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকগণও শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের সহযোগীতা করতে পারে।

২. **বিশ্বায়ন কৌশল (Global strategy)** ঃ বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশগত নানা সুযোগ ও হুমকিসমূহ শনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়। কাজেই কর্পোরেট কৌশলে বিশ্বায়নকে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বায়ন কৌশলের মাধ্যমে বিদেশি দেশের সাথে কৌশলগত মিত্র এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়।

৩. **সুনির্দিষ্ট (Specific)** ঃ কর্পোরেট কৌশল সাধারণত মধ্যম বা নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য জন্য উচ্চ স্তরের নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। কাজেই কর্পোরেট কৌশল অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে যে সকল কৌশল গ্রহণ করা হবে তা অবশ্যই কার্যসম্পাদান মুখী এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৪. **মেয়াদকাল (Duration)** ঃ কর্পোরেট কৌশল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হতে পারে। তবে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদীকৌশলের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল কেমন হবে তা মূলত নির্ভর করে এর আকার আকৃতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট্যের উপর।

৫. **প্রতিযোগিতামুলক (Competitive)** ঃ কর্পোরেট কৌশল থেকে নানা রকম প্রতিযোগীতামূলক সুবিধা পাওয়া যায়। কারণ এতে প্রতিটি কৌশলের জন্য কতকগুলো সুবিধা পছন্দ থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান তার প্রতিযোগীদের চেয়ে অনুকূলে রাখতে সহায়তা করে।

৬. **দিক-নির্দেশনা (Direction)** ঃ কর্পোরেট কৌশলের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক প্রণীত হয় বিধায় কর্পোরেট কৌশলের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান থাকে।

৭. **বাস্তবায়নযোগ্যতা (Implementable)** ঃ কর্পোরেট কৌশল এর মাধ্যমে যে কৌশল প্রণীত হয় তা অবশ্যই বাস্তবায়নযোগ্য ও সঠিকভাবে প্রণীত হতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কৌশলকে সঠিকভাবে কাজে পরিণত করার কর্মপন্থা বিদ্যমান থাকবে।

৮. **ঝুঁকি হ্রাস (Reducing risk)** ঃ কর্পোরেট কৌশল সাধারণতঃ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত হয়। ফলে এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কার্যসম্পাদনের জটিলতা এবং পরিবেশগত অনিশ্চয়তার ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা এতে বিদ্যমান থাকবে।

৯. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal and objectives)** ঃ কর্পোরেট কৌশলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবমুখী হবে এবং এতে বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এছাড়াও কর্পোরেট কৌশল বহুমুখী হতে হবে এবং সেগুলোকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

১০. **সহযোগিতামুলক প্রচেষ্টা (Cooperative effort)** ঃ কর্পোরেট কৌশলে বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সহযোগীতামূলক প্রচেষ্টা থাকে। এ কৌশল শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত হলেও এতে মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকরাও সহযোগীতা করে থাকে এবং এতে সবার জন্য সঠিক নির্দেশনা বিদ্যমান থাকবে।

১১. **সুযোগ-সুবিধা (Benefits)** ঃ কর্পোরেট কৌশলের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র, বাজার ও আর্থিক দক্ষতা, প্রকল্প গবেষণা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলো বিবেচনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কর্পোরেট কৌশলগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক দলিল হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিষ্ঠানভেদে এ বৈশিষ্ট্যগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক প্রকৃতির হয়ে থাকে। সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের ব্যস্থাপকগণ এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন।

কর্পোরেট কৌশলের উপাদানসমূহ

Components of Corporate Strategy

প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকের জন্য ব্যবসায় পরিচালনার সাধারণত যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল (Corporate Strategy) বলে। অর্থাৎ মূল কোম্পানির পক্ষ থেকে শাখা কোম্পানির জন্য যে স্বল্পমেয়াদী বা দীঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল বলে। বাজারের বাহ্যিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নির্বাহীগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের হুমকি ও সুযোগসমূহ পর্যালোচনা করে সঠিক কৌশল গ্রহণ করা সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো উপাদান বিবেচনা করা হয়। Orville C. Walker, Harper W. Boyd & Jean-Claude Larréché প্রমুখ লেখকগণ কর্পোরেট কৌশলের কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। নীচে চিত্রের মাধ্যমে উপাদানসমূহ উপস্থাপন ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ

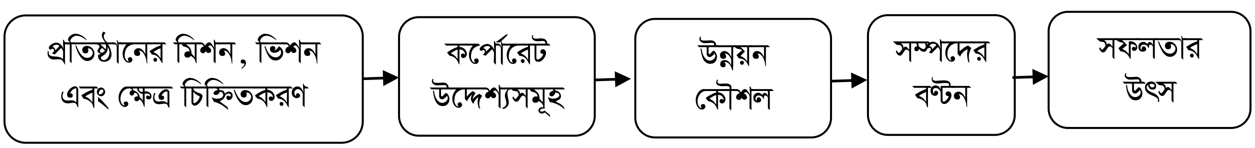

চিত্রঃ কর্পোরেট কৌশলের উপাদানসমূহ

১. **প্রতিষ্ঠানের মিশন, ভিশন এবং ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ (Identifiction of mission, Vision and area of the organization)** ঃ কর্পোরেট কৌশল নির্ধারণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমেই তার মিশন ও ভিশন ঠিক করতে হয়। মূলত প্রতিষ্ঠানটি কোথায় আছে আর কোথায় যেতে চায় তা নির্ধারণ করাই হলো মিশন ও ভিশন ঠিক করা। এ পর্যায়ে ক্রেতাদের প্রয়োজন নির্ধারণ, বাজার বিভক্তিকরণ এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া কোম্পানির ব্যয় সামর্থ্য, জনবল, সম্পদ, এবং সমস্যাগুলোও নির্ধারণ করা হয়, যা টেকসই প্রতিযোগীতামূলক সুবিধার কৌশল উন্নয়নের সহায়ক হয়।

২. **কর্পোরেট উদ্দেশ্যসমূহ (Corporate objectives)** ঃ কর্পোরেট কৌশলগুলোর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্পোরেট উদ্দেশ্যে নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সকল দিক বিবেচনায় আনতে হয় তা হলো-

   ক) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কীভাবে পরিমাপ করা হবে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।
   খ) কার্যক্রম পরিমাপের ধরণ, লেভেল ও লক্ষ্যস্থিত সময় সুনির্দিষ্ট করা।
   গ) নতুন পণ্যের মান উন্নয়ন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও তাদের উন্নয়নের মাত্রা ঠিক করা।

৩. **উন্নয়ন কৌশল (Development strategy)** ঃ কর্পোরেট কৌশলের অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের প্রত্যাশিত উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ

করা হয়। বিশেষ করে নতুন পণ্যের ব্যবসায় করা যাবে কিনা এবং যদি তা করা যায় তবে কীভাবে করা যাবে তা এ পর্যাযে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান ব্যবসায় প্রসার করে তা থেকে উন্নয়ন সম্ভব কিনা তা-ও উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

৪. **সম্পদের বণ্টন (Distribution of assets)** ঃ কোম্পানির কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দক্ষতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদের যথাযথ বণ্টন করা। এতে করে প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করার মাধ্যমে ক্রেতা ভ্যালু অর্জন করা কোম্পানির জন্য সহজতর হয়। সীমিত সম্পদের দ্বারা কিভাবে উচ্চতর উৎপাদন সম্ভব তাও এই পর্যায়ে সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়। আর এজন্য অবশ্যই কাজের সময় অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রার উপর সঠিকভাবে আলোকপাত করতে হবে।

৫. **সফলতার উৎস (Sources of success)** ঃ কর্পোরেট কৌশলের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক নির্দেশনা দান। তাই বলা যেতে পারে যে, কর্পোরেট কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সফলতার উৎস খুজে বের করা। সফলতার উৎস হিসেবে কতকগুলো বিষয়কে বিবেচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হলো-
   ক) বাজারে পণ্যের আনুগত্য;
   খ) কর্মীদের যোগ্যতা ও জ্ঞানের পরিধি;
   ঘ) প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি ইত্যাদি

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানকে বাজারে ফলপ্রসু প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে উপনীত হওয়া এবং তা ধরে রাখতে হলে অবশ্যই নিজেদের সামর্থ্য, শক্তি ও সম্পদের বিবেচনা করে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকের জন্য ব্যবসায় পরিচালনার সাধারণত যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল (Corporate Strategy) বলে। কর্পোরেট কৌশল দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবমুখি হতে হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে কর্পোরেট কৌশল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানভেদে কর্পোরেট কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। কর্পোরেট কৌশল হলো কোম্পানির উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত ও প্রণীত একটি স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তাদের বিপণন কার্যক্রমের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভ্যালু সৃষ্টি করে। কর্পোরেট কৌশল সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী হয় বিধায় এর মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। কর্পোরেট কৌশলের মধ্যে ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি, নতুন বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র, বাজার ও আর্থিক দক্ষতা, প্রকল্প গবেষণা, ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলো বিবেচনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে।

পাঠ-২.২ ব্যবসায় কৌশল ও বিপণন কৌশলের উপাদানসমূহ
Business Strategy and Marketing Strategy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায় কৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন
- বিপণন কৌশল এর সংজ্ঞা জানতে পারবেন
- ব্যবসায় কৌশলের প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- বিপণন কৌশল ও ব্যবসায় কৌশলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

ব্যবসায় কৌশল এর সংজ্ঞা
Definition of Business Strategy

প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকের জন্য ব্যবসায় পরিচালনার সাধারণত যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল বলে। কর্পোরেট কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্যবসায় কৌশল। কোন একটা নির্ধারিত শিল্প অথবা বাজারে ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য সংগঠন কর্তৃক যে সকল বিকল্পসমূহ পছন্দ করা হয় তাকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। ব্যবসায় কৌশল প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায় ইউনিটের (Business Unit) সম্পর্কিত হয় আর যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কৌশলগত ব্যবসায় একক (Strategic Business Unit) বা সংক্ষেপে SBU বলা হয়।

Jay B. Barney & Ricky W. Griffin এর মতে, "Business strategy is the set of strategic alternatives that an organization choose from as it conducts business in a particular industry or aparticular market" অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শিল্পে বা বাজারে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সংগঠনের যে সকল কৌশলগত বিকল্প পছন্দ করা হয় তাকে ব্যবসায় কৌশল বলে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে ব্যবসায় কৌশলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হল-

- ব্যবসায় কৌশল একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় এককের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- ইহা মূলত কৌশলগত বিকল্প মূল্যায়নের সাথে সম্পৃক্ত।
- ব্যবসায় কৌশল ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতমূলক কাঠামো নির্ধারণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় এককের সাফল্য আনয়নের জন্য যে কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয় তাই হলো ব্যবসায় কৌশল।

বিপণন কৌশল এর সংজ্ঞা
Definition of Marketing Strategy

কৌশল বলতে এমন কিছু পন্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে, "Strategy means the ways to achieve organizational goals." অন্যদিকে, পণ্য বা সেবা বিপণনের ক্ষেত্রে কে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে প্রতিযোগিতা করা হবে সে সম্পর্কিত উচ্চ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কৌশল

প্রনয়ন করাকে বিপণন কৌশল (Marketing Strategy) বলে। নীচে বিপণন কৌশলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

Philip Kotler & Gary Armstrong এর মতে, "Marketing strategy is the marketing logic by which the business unit hopes to create customer value and achieve profitable customer relationships." অর্থাৎ, বিপণন কৌশল হচ্ছে এমন একটি বিপণন দর্শন যার মাধ্যমে ব্যবসায় ইউনিটসমূহ ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করে এবং লাভজনক ক্রেতা সম্পর্ক অর্জনের প্রত্যাশা করে থাকে।

William D. Perreault & Edmund Jerome McCarthy এর মতে, "Marketing strategy specifies a target market and a related." অর্থাৎ, অভীষ্ট বাজার এবং সম্পর্কযুক্ত বিপণন মিশ্রণ নির্দিষ্ট করাই হলো বিপণন কৌশল।

তাই বলা যায় যে, বিপণন কৌশল হচ্ছে এমন কতকগুলো কার্যক্রমের সমষ্টি যার মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদানসহ সন্তুষ্টি প্রদানের চেষ্টা করা হয়। এরূপ কৌশলে বিপণন কার্যক্রম বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞার আলোকে বিপণন কৌশলের যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ বিপণন কৌশল হচ্ছে কতকগুলো উপায় বা কর্মপন্থা।
- ✓ এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করা হয়।
- ✓ বিপণনের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাদের সাথে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

সাধারণত বিপণন কৌশলের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং ক্রেতাদের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মপন্থা বেছে নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বিপণন কৌশল অনুযায়ী কোম্পানিকে কে বিপণন মিশ্রণ উন্নয়ন করতে হয়।

ব্যবসা কৌশল এর প্রকারভেদ

Classification of Business Strategy

কর্পোরেট পর্যায়ে কোন একটি নির্ধারিত শিল্পে বা বাজারে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সংগঠনগুলো যে কৌশলগত বিকল্প পছন্দ করে থাকে তাকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণে সংগঠনগুলো অবস্থাভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বিভিন্ন লেখকও ব্যবসায় কৌশলকে বিভিন্নভাবে পৃথকীকরণ করেছেন।

বিখ্যাত লেখক Michael E. Porter ব্যবসায় কৌশলকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। অপর একজন লেখক Raymond E. Miles & Charles C. Snow ব্যবসায় কৌশলকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। উক্ত লেখকের মতামতের ভিত্তিতে চারটি ব্যবসায় কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **সম্ভাবনা অনুসন্ধান কৌশল (Prospector Strategy):** এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত: নতুন পণ্যের প্রবর্তনকারী হয়ে থাকে। ব্যবসায় কৌশলের এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করে প্রথমে এক একটা বাজারে ছাড়ে। তারপর যে পণ্য ক্রেতার আকর্ষণ করতে সামর্থ্য হয় এবং যেটি ক্রেতার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় সে পণ্যটি ব্যবসায়ের জন্য বাছাই করা হয়। ইহা একটি ব্যয় বহুল প্রক্রিয়া।

২. **রক্ষামূলক কৌশল (Defender Strategy):** এ কৌশলে সংগঠনগুলো কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের মানের উপর

অধিক গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পণ্যের বাজার প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। অর্থাৎ এ কৌশলে প্রচলিত পণ্য বা সেবার মূল্য যথাসাধ্য কমিয়ে উক্ত পণ্য বা সেবার মান বাড়িয়ে পণ্যটিকে বাজারে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে গৃহীত কৌশলগুলো হলো-

- ✓ প্রচলিত পণ্য বা সেবার মূল্য যথাসাধ্য কম ধার্য করা
- ✓ পণ্য বা সেবার মান উচ্চ পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা
- ✓ পণ্য বা সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখা।

৩. **বিশ্লেষণমূলক কৌশল (Analyzer Strategy):** এ কৌশলে মূলত সম্ভাবনা অনুসন্ধান কৌশল ও রক্ষামূলক কৌশলের মধ্যে সংমিশ্রণ গঠানো হয়। অর্থাৎ, সম্ভাবনা অনুসন্ধানমূলক কৌশল এবং রক্ষামূলক কৌশলের সংমিশ্রণে গঠিত কৌশলকে বিশ্লেষণ মূলক কৌশল বলে। একটি প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষেত্রে এ কৌশল গ্রহণ করতে পারে তা হলো-

- ✓ যখন প্রচলিত পণ্য দিয়ে বাজারে লাভবান হওয়া যায় না
- ✓ নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে পণ্য বা সেবার চাহিদা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- ✓ যে ক্ষেত্রে আগামীতে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে বলে পরিগণিত হয় সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক কৌশল গ্রহণ করা হয়।

৪. **প্রতিক্রিয়ামূলক কৌশল (Reacter Strategy):** বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যে ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রতিক্রিয়ামূলক কৌশল বলে। এতে পূর্ব থেকে কোন কৌশল নির্ধারিত থাকে না। হঠাৎ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এ কৌশল গৃহীত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায় কৌশল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। সংগঠনগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপরের যে কোন বা একাধিক কৌশল গ্রহণ করতে পারে।

বিপণন কৌশল ও ব্যবসায় কৌশলের মধ্যে পার্থক্য

Deference between Marketing and Business Strategy

ভোক্তাদের জন্য ভ্যালু সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধান ও বিপণন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাকে বিপণন কৌশল (Marketing Strategy) বলা হয়। অপরপক্ষে, নির্ধারিত শিল্প বা বাজারে ব্যবসায় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সংগঠনের জন্য যে সকল কৌশলগত বিকল্প পছন্দ করা হয় তাকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। এদের মধ্যকার বিশেষ পার্থক্যগুলো নিম্নে দেখানো হলোঃ

পার্থক্যের বিষয়	বিপণন কৌশল	ব্যবসায় কৌশল
১। সম্পর্ক	বিপণন কৌশল ভোক্তাদের প্রয়োজন ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।	ব্যবসায় কৌশল সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যবসায় এককের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
২। উদ্দেশ্য	বিপণন কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ভ্যালু বা সুবিধা তৈরি করা।	ব্যবসায় কৌশল ব্যবসায়ের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে।
৩। অবস্থান	বিপণন কৌশল প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রেতা অবস্থান করে।	ব্যবসায় কৌশল এককের কেন্দ্র বিন্দুতে সংগঠন অবস্থান করে।
৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা	এটি কোম্পানির মিশন সংজ্ঞায়ন, বাজারমুখী উদ্দেশ্য নির্ধারণ, ব্যবসায় খাতের নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে বিপণন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা	এ কৌশল ব্যবসায় একক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোম্পানি তার লাভজনক ও অলাভজনক ব্যবসায় চিহ্নিত করে কার্যকর সিদ্ধান্ত দিতে

	করে।	পারে।
৫।প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা	বিপণন কৌশল প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে।	এ কৌশলের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।
৬। নির্ভরতা	বিপণন কৌশল অনেকাংশে ব্যবসায় কৌশলের উপর নির্ভর করে।	ব্যবসায় কৌশল বিপণন কৌশলের উপর নির্ভর করে না।
৭। প্রধান কাজ	উপযুক্ত বাজার তথ্য দিয়ে সাহায্য করা হলো বিপণন কৌশলের প্রধান কাজ।	প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক উপায় নির্ধারণ ও বিপণন কর্মসূচি প্রণয়ন ব্যবসায় কৌশলের প্রধান কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিপণন কৌশল ও ব্যবসায় কৌশলের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও এরা একে অন্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বিপণন কৌশল ও ব্যবসায় কৌশলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ব্যবসায়ের সার্বিক সাফল্য আনয়নে সমানভাবে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

কৌশল বলতে এমন কিছু পন্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিপণন কৌশল হচ্ছে বিপণনের এমন দর্শন যার মাধ্যমে ব্যবসায় ইউনিটগুলো ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি এবং লাভজনক ক্রেতা সম্পর্ক অর্জনের প্রত্যাশা করে থাকে। বিপণন কৌশল হচ্ছে এমন কতকগুলো কার্যক্রমের সমষ্টি যার মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে সর্বোচ্চ ভ্যালু প্রদানসহ সন্তুষ্টি প্রদানের চেষ্টা করা হয়। এরূপ কৌশলে বিপণন কার্যক্রম বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নির্ধারিত শিল্প বা বাজারে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সংগঠনসমূহ যে কৌশলগত বিকল্প পছন্দ করে থাকে তাকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। কোম্পানির উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকের জন্য ব্যবসায় পরিচালনার জন্য যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল (Corporate Strategy) বলে। অন্যদিকে, উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায় ইউনিটের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কৌশলকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। পক্ষান্তরে, পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রতিযোগিতা করা হবে সেসম্পর্কিত উচ্চ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের ভিত্তিকে বিপণন কৌশল (Marketing Strategy) বলে। Corporate কৌশলের অন্যতম কাজ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও প্রযুক্তির সমাহার এবং বণ্টনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা। অন্যদিকে, ব্যবসায় কৌশলের কাজ হলো প্রতিটি ব্যবসায় এককের (Strategic Business Unit) সুযোগ ও হুমকি এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা।

পাঠ-২.৩ কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপ ও বিবেচ্য উপাদানসমূহ
Steps and Considering Factors of Strategic Marketing Process

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যবসায় ও কর্পোরেট কৌশল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

Steps in Strategic Marketing Process

ক্রেতাদের প্রয়োজন নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত বিপণন কার্যক্রমকে কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়া বলে। যে প্রতিষ্ঠান যত বেশি বিপণন কৌশল অনুসরণ করতে পারবে সে প্রতিষ্ঠান ততবেশি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারবে। কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ায় কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো:

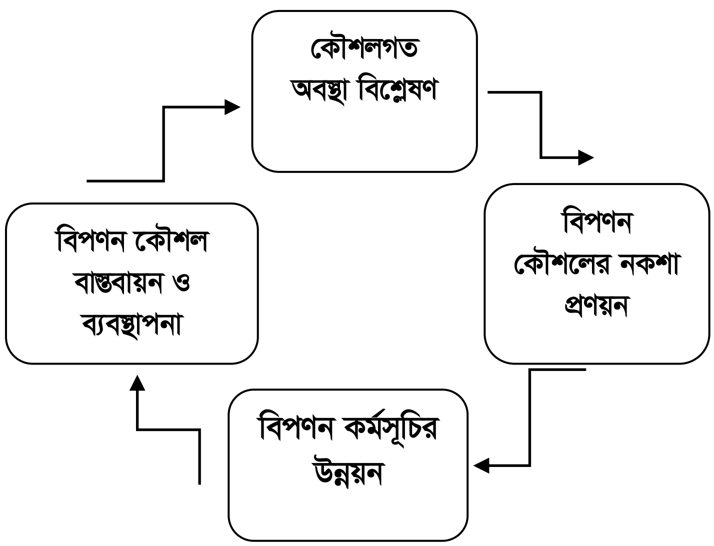

চিত্র: কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

(ক) কৌশলগত অবস্থা বিশ্লেষণ (Strategic situation Analysis): কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়ার প্রথমে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থাপনার পরিবেশ বিশ্লেষণ করা হয় যা নতুন কৌশল বা পুরাতন কৌশল প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কৌশলের মূল্যায়ন করে পরবর্তী কৌশলের দিকে ধাবমান হয়। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। নিচে কৌশলগত অবস্থা বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **বাজার ও প্রতিযোগী বিশ্লেষণ (Market and competitor analysis)**: এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতার প্রয়োজন ও অভাব মেটানো সম্ভব এবং যা তাদের ক্রয়ক্ষমতা ও ক্রয় ইচ্ছার মধ্যে আছে এমনসব পণ্য বা পণ্য সারির উপর জোর দেওয়ার

মাধ্যমে বাজার বিশ্লেষণ করা যায়। তার পাশাপাশি প্রতিযোগীদের সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার উপায় নির্ধারণ করা যায়।

২. **বাজার বিভক্তিকরণ (Market segmentation):** বাজার বিভক্তিকরণের মাধ্যমে ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ ও ক্রয় ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কতকগুলো উপ-দলে বিভক্ত করা হয়। এতে করে বাজারজাতকারী ভোক্তার প্রয়োজন ও অভাবের ভিন্নতা সহজেই বুঝতে পারে, যা প্রতিষ্ঠানের সফলতার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

৩. **বাজার সম্পর্কিত ধারাবাহিক জ্ঞান (Continuous learning about market):** পূর্বে বাজার অবস্থা কেমন ছিল, বর্তমান বাজারে কী ঘটছে, ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা বিবেচনা করে বিপণন কৌশল প্রণয়ন এবং তা থেকে নতুন কী কী সুবিধা গ্রহণ করা যায় সেগুলোর উপর এখন ব্যবস্থাপকরা বেশি গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে বাজার তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(খ) বিপণন কৌশলের নকশা প্রণয়ন (Designing marketing strategy): কৌশলগত বাজারজতাকরণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ হলো বিপণন কৌশলের নকশা প্রণয়ন করা। অর্থাৎ বাজার লক্ষ্য নির্ধারণ, অবস্থান গ্রহণ কৌশল প্রণয়ন, নতুন পণ্যের পরিকল্পনা প্রণয়ন,নতুন পণ্যের উন্নয়ন ও পরিচিতিকরণ ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে বিপণনের নকশা প্রণয়ন করা হয়। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **বাজার লক্ষ্য নির্ধারিণ ও অবস্থান গ্রহণ কৌশল (Market Tergeting and Positioning strategy):** কোনো কোম্পানির মূলত বিভাজিত বাজার অংশ থেকে বাজার লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে সুবিধাজনক বাজার অংশ বেছে নেওয়াই হলো বাজারে অবথান গ্রহণ। কোম্পানির সমার্থ্যের সাথে লক্ষ্য নির্দিষ্ট বাজারের প্রয়োজনসমূহ এর সংযোগ ঘটানোই বাজার লক্ষ্য নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য।

২. **সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন কৌশল (Marketing relationship strategies):** ক্রেতাদেরকে সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সম্পর্কভিত্তিক বিপণন কৌশল সহায়ক হয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রান্তিক ভোক্তা, চ্যানেল সদস্য, সরবরাহকারী, প্রতিযোগী এবং অভ্যন্তরীণ সংগঠনের সদস্যগণ হচ্ছেন সম্পর্ক ভিত্তিক বাজারের অংশীদার। আর সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন কৌশল বলতে এই সকল অংশীদারদের মধ্যকার সম্পর্ক কৌশলকে বুঝায়।

৩. **নতুন পণ্যের জন্য পরিকল্পনা (Planning for new products**): নতুন পণ্য আবিষ্কার বা পণ্যের নতুন ব্যহারকে নতুন পণ্য বলা যায়। ক্রেতাদের পরিবর্তিত প্রয়োজন ও প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য কোম্পানিকে নতুন নতুন পণ্যের কথা চিন্তা করে ঐ সকল পণ্যের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়।

৪. **নতুন পণ্য উন্নয়ন ও পরিচিতিকরণ (Developing and Introducing new products):** নতুন পণ্যের জন্য যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন ক্রেতা সন্তুষ্টির গ্যাপ চিহ্নিত করা সহজ হয়। আর ক্রেতা সন্তুষ্টির গ্যাপ চিহ্নিতকরণ বেশ ফলপ্রদ হয় যখন ক্রেতাদের প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধান করে গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করা হয়। কাজেই বিপণনের নকশা প্রণয়নের সময় নতুন পণ্য পরিচিতি করানো হয়। নতুন পণ্যের উন্নয়ন ও চিহ্নিতকরণে যে সকল ধাপ অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো-

- ✓ ধারণা অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন
- ✓ সর্বোচ্চ উৎসাহ ব্যঞ্জক ধারণা সৃষ্টি
- ✓ পণ্যের নকশা প্রণয়ন
- ✓ বিপণন কর্মসূচির উন্নয়ন ইত্যাদি।

(গ) বিপণন কর্মসূচির উন্নয়ন (Marketing Program Development): এ পর্যায়ে বাজার লক্ষ্য নির্ধারণ ও অবস্থান গ্রহণ কৌশল নির্ধারণে কোম্পানিকে বিপণন কর্মসূচির উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। বিপণন কর্মসূচির অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কোন কোম্পানি কী পণ্য বা সেবা কত পরিমাণে উৎপাদন করবে, সেগুলোর মূল্য কী হবে, তারা কোন ধরণের প্রমোশন হাতিয়ার ব্যবহার করবে এবং কীভাবে তা বণ্টন করা হবে ইত্যাদি। কাজেই বিপণন কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত বিপণন কর্মসূচি বা বিপণন মিশ্রণের উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয়। নিচের চিত্রের মাধ্যমে বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো-

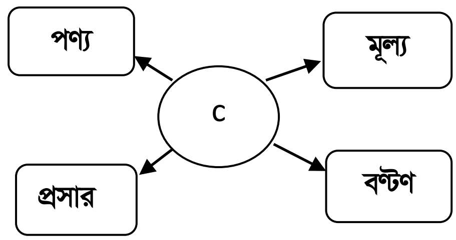

চিত্র: অবস্থান গ্রহণ কৌশল উন্নয়ন

১. **পণ্য কৌশল (Product strategy):** পণ্যের অন্তর্ভূক্ত হলো পণ্যের মান, নকশা,পণ্যের ব্র্যান্ড, পণ্যের রং, স্টাইল, পণ্যের প্যাকেজিং ইত্যাদি। নতুন পণ্যের পরিকল্পনা প্রণয়ন, পণ্যের জীবন চক্র বিবেচনায় সফল পণ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল পণ্য চিহ্নিত করা এবং এ সকল পণ্যের কি করা হবে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে পণ্য কৌশল বলে।

২. **মূল্য কৌশল (Price strategy):** বাজরজাতকরণ মিশ্রণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মূল্য কৌশল নির্ধারণ। এ প্রক্রিয়ায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সাধারণ কৌশল, মূল্য সমন্বয় কৌশল এবং নতুন প্রবর্তিত পণ্যের মূল্য কৌশল নিয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানি বাজারে টিকে থাকতে পারে।

৩. **প্রমোশন কৌশল (Promotion Strategy):** পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে জানানো এবং তাদেরকে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রমোশন কৌশল ব্যবহার করা হয়। প্রমোশন কৌশলের হাতিয়ারসমূহ যেমন- বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিক বিক্রয়, বিক্রয় প্রসার, প্রচার ইত্যাদির কোথায়, কখন ও কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার সঠিক নির্দেশনার জন্য প্রমোশন কৌশল প্রণয়ন করা হয়।

৪. **বণ্টন কৌশল (Distribition Strategy):** উৎপাদিত পণ্য যথাসময়ে ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর যাবতীয় প্রক্রিয়াই হলো বণ্টন। বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের এ সর্বশেষ ধাপে হচ্ছে বণ্টন কৌশল অর্থাৎ উপযুক্ত বণ্টন প্রণালী নির্বাচন করা। বিপণন কর্মসূচি উন্নয়নের এ স্তরে কোম্পানিকে আরো দু'টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যথা:
(ক) কৌশলগত ব্র্যাণ্ড ব্যবস্থাপনা
(খ) ভ্যালু চেইন, মূল্য ও প্রসার কৌশল

(ঘ) বিপণন কৌশল বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা (Implementing and Managing Marteking Strategy): বিপণন কৌশল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ হলো বিপণন কৌশলের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা। এ পর্যায়ে বিপণনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনার জন্য অর্থায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজগুলো যথাযথ প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হলো:

- ✓ বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট প্রস্তুতকরণ

- ✓ বিপণন সংগঠনের নকশা প্রণয়ন
- ✓ কৌশলের বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ
- ✓ চলমান প্রক্রিয়ার কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনার কাজ হলো- বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী কে, কখন, কোথায় ও কীভাবে পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করাই হলো বিপণন কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা।

ব্যবসায় বা কর্পোরেট কৌশল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য উপাদানসমূহ

Factors Affecting Development of Business or Corporate Strategy

ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বিশ্বায়নের প্রভাব মোকাবেলায় সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাই হলো ব্যবসায় কৌশল। কৌশলগত এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনেকগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো-

১. **নমনীয়তা (Flexibility):** কৌশলের নমনীয়তা বা পরিবর্তনশীলতা যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন ব্যবসায় পরিবেশ পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি করে ব্যবসায় কৌশলের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। তা না হলে সংগঠনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হতে পারে। ব্যবসায় কৌশলের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানোর জন্য নিচের পাঁচটি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়-

   i. **দৃশ্যপট বিবরণী প্রস্তুত (Scenario building):** ফলাফল বিবেচনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন হয়। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে কৌশলসমূহ পরিবর্তন করা যায়। তাই পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তার কথা মাথায় রেখে দৃশ্যপট বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

   ii. **বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণ (Reality checks):** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারকগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী তা জানার চেষ্টা করে। যদি আগে থেকেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য জানা থাকে তবে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজতর হয়।

   iii. **কর্মী সংগ্রহ (Hires):** ব্যবসায় কৌশলে নমনীয়তা অর্জনের জন্য কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ উপযুক্ত কর্মী না হলে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই নমনীয়তা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই উপযুক্ত, বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতন থাকে এমন কর্মী বাছাই করতে হবে।

   iv. **বাজেট চক্র সংক্ষিপ্তকরণ (Shorteing the budgetet cycle):** ব্যবসায় কৌশলের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। আর এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা আরোও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৌশলের পরিতর্বনের সাথে সাথে বাজেটও কম-বেশি করার দরকার পড়ে। তাই নমনীয়তা অর্জনের জন্য অবশ্যই বাজেটের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অর্থাৎ বাজেট চক্র অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে।

   v. **যোগাযোগ (Communication):** কৌশলের নমনীয়তার ক্ষেত্রে যোগাযোগের নমনীয়তা অর্জনের বেশ স্পর্শকাতর বিষয়। যোগাযোগের সাহায্যে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে কৌশল পরিবর্তনের বিষয়টি জানানো যায়। এতে তাৎক্ষণিক ফলাফল পাওয়াও সহজতর হয়।

২. **পরিবেশ (Environment):** আমরা জানি, পরিবেশের উপাদানগুলো সর্বদাই পরিবর্তনশীল। হোক সেটা প্রাকৃতিক বা ব্যবসায়িক পরিবেশ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও ঠিক তেমন করেই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিবর্তন ব্যাহত থাকে। সেজন্য ব্যবসায় কৌশল গ্রহণের সময় অবশ্যই পরিবেশগত পরিবর্তনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

৩. **মৌলিকতা যোগ্যতা (Core competencies):** পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী মোকাবেলা করার জন্য শুধুমাত্র ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতাই যথেষ্ট নয়। এ জন্য সংগঠনের কিছু ব্যতিক্রমী দক্ষতা বা যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সঠিকভাবে মোকাবেলা করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। নিচে এসব যোগ্যতার বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো:

i. **শ্রমশক্তি (Work force): উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শ্রমশক্তি। তাই** ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণেরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শ্রম শক্তি। এই শ্রম শক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক কঠিন সমস্যারও সমাধান করতে পারে। তাই ব্যবসায় কৌশলের ক্ষেত্রে সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শ্রমশক্তি নির্বাচন করা জরুরি।

ii. **বাজার ও অর্থায়ন সংক্রান্ত জ্ঞান (Market and Financial knowledge): প্রতিষ্ঠানের** নির্বাহী ব্যবস্থাপককে অবশ্যই কর্মকৌশল নির্ধারণের সময় পণ্য বা সেবার বাজার এবং অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে একজন নির্বাহী কৌশলটির যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করে ক্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে পারেন। এভাবেই একটি উন্নত ও কার্যকর ব্যবসায় কৌশল প্রণয়ন করা যায়।

iii. **তথ্য পদ্ধতি ও প্রযুক্তি (Information system and technology):** সংগঠনের কৌশল তৈরি করার সময় বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে চাইলে সংগঠনের আধুনিক তথ্য ব্যবস্থা ও প্রবাহ এবং প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে। ইন্টারনেট কিংবা ই-কমার্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য কৌশল নির্ধারণ করার অনেকটা ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া যায়।

iv. **সুযোগ-সুবিধা (Facilities):** ব্যবসায় সংগঠনগুলো মূলত প্রাথমিক সুবিধা লাভ করে অফিস, গুদামঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির স্থানগত সুযোগ-সবিধার মাধ্যমে। যা ব্যবসায় কৌশলের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর এ ধরণের সুযোগ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাজার প্রতিযোগিতায় মোকাবেলা করতে পারে।

৪. **বিশ্বায়নের কৌশল (Global Stragegies): বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করার জন্য বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রেখে তাদের কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ** যেসব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের পণ্য বা সেবা ব্যবসায় পরিচালনা করে তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বায়ন কৌশল প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বায়ন কৌশলের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনা করতে হবে:

i. **কৌশলগত মিত্র (Strategic alliances):** ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রবেশ বাড়ানোর জন্য ব্যবসায় 'মিত্র অনুসন্ধান' করতে হবে। আর এই কৌশলগত মিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। তিনটি উপায়ে কৌশলগত মিত্র সৃষ্টি করা যায়। যেমন:

(ক) যৌথ প্রচেষ্টা (Collaborating effort): যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করে এবং অপর পরিষ্ঠান এই দক্ষতার প্রয়োজন অনুভব করে। তখন এই দু'টি প্রতিষ্ঠান তাদের

পারস্পরিক স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং একে অন্যের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অধিকতর সুবিধা পেতে পারে। এভাবেই পরস্পর যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দু'টি পক্ষের মধ্যে মিত্রতার সৃষ্টি হয়।

(খ) যৌথ ব্যবসায় (Joint venture): যৌথ ব্যবসায় বলতে বুঝায় যখন আইনগতভাবে দু'টি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। মুলত বিদেশের বাজারে পণ্য বা সেবার প্রবেশের ক্ষেত্রে এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্খিত দেশে প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করে আর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানটি কর্ম সম্পাদনের জন্য শ্রমিক ও আনুষাঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করে। এভাবেই তারা পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে যৌথ ব্যবসায় পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করে।

(গ) প্রযুক্তি লাইসেন্স (Technology licensing): কোনো কোম্পানি যদি তাদের পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পদ্ধতি কৌশলগত মিত্রের যে চুক্তির মাধ্যমে অন্যকে প্রদান করে তাকে প্রযুক্তি লাইসেন্সিং বলা হয়। আজকাল বিদেশী বাজারে প্রবেশের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ একটি অন্যতম আবশ্যকীয় পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ii. **বহি:র্বিশ্বে অবস্থান নির্ধারণ (Locating abroad):** বিশ্ব বাজারে প্রবেশের অন্যতম আরেকটি পদ্ধতি হলো সে দেশে অবস্থান গ্রহণ। অর্থাৎ দেশে নিজ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা। অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজ দেশে পণ্য উৎপাদনে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তখন তিনি অন্য দেশে উৎপাদন ইউনিট প্রস্তুত করে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করে। যেমন- বাংলাদেশে (FPZ) গুলোতে অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র বিশ্ববাজারে প্রবেশের জন্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায় কৌশল প্রণয়নের জন্য উপরে আলোচিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে তার কৌশল প্রণয়ন করতে পারে। তবে একসঙ্গে সবগুলো কৌশল বাস্তবায়ন সম্ভবপর নাও হতে পারে। এ কৌশলগুলো প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রণীত কৌশলগুলোও কার্যকর হবে ।

সারসংক্ষেপ

ক্রেতাদের প্রয়োজন নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত বিপণন কার্যক্রমকে কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়া বলে। কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো- বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী কে, কখন, কোথায় ও কীভাবে পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করাই হলো বিপণন কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা। বিপণন কর্মসূচির অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কোন কোম্পানি কী পণ্য বা সেবা কতটুকু উৎপাদন করবে, সেগুলোর মূল্য কী হবে, তারা কোন ধরণের প্রমোশন হাতিয়ার ব্যবহার করবে এবং কীভাবে তা বণ্টন করা হবে ইত্যাদি। কাজেই বিপণন কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচি বা বিপণন মিশ্রণের উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বিশ্বায়নের প্রভাব মোকাবেলায় সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাই হলো ব্যবসায় কৌশল। কৌশলগত এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনেকগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নানা কৌশলগত দিক যেমন-নমনীয়তা, প্রবেশযোগ্যতা, ব্যবসায়িক শক্তি,বিদেশে প্রবেশ যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

পাঠ-২.৪ কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ণের ধাপসমূহ ও ইহার গুরুত্ব

Steps and Importance of Strategic Marketing Plan

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কৌশলগত পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কৌশলগত পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ জানতে পারবেন।

কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ণের ধাপসমূহ

Steps of Strategic Marketing Planning

কৌশলগত পরিকল্পনা হলো বিপণন সংক্রান্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার মাধ্যমে বাজারের ভবিষ্যতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগসমূহ গ্রহণ করা হয়। কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নে কোম্পানিকে কতকগুলো স্তর বা পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন-কোম্পানীর মিশণ সংজ্ঞায়িতকরণ, কোম্পানির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরকরণ, ব্যবসায়ের পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ এবং বিপণন কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রণয়ণ। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

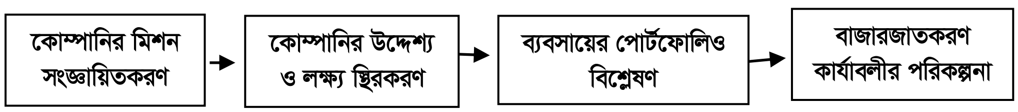

চিত্র: কৌশলগত পরিকল্পনার উপাদানসমূহ

১. **কোম্পানির মিশন সংজ্ঞায়িতকরণ (Defining the company mission) :** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু মিশন বা ব্রত থাকে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের এ স্তরে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা ব্রত নির্দিষ্ট করতে হয়। উল্লেখ্য যে, ব্রত (মিশন) বলতে প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিকে বুঝায় যা ব্যবস্থাপককে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

নিচে উত্তম মিশন বিবৃতির (Mission statement) কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

i. **সীমিত সংখ্যক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য (Limited number of objectives or goals):** মিশন বা ব্রত বিবৃতিতে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও সীমিত হতে হবে। যেমন-বারডেম হাসপাতালের উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিক রোগীদেরকে সেবা প্রদান করা।

ii. **পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Matching with environment):** মিশন বিবৃতি অবশ্যই পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেমন-বর্তমান বিশ্বে পণ্য বাজারজাতকরণে 'গ্রিণ মার্কেটিং' ধারণার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

iii. **নীতি ও ভ্যালুর প্রতি গুরুত্বারোপ (Stress on the policies and Values):** মিশন বিবৃতিতে কোম্পানির মৌলিক নীতিসমূহ এবং ক্রেতা ভ্যালুর বিষয়টি প্রাধ্যন্য পাবে। যেমন- বাটা সুজ কোম্পানির নীতি হলো টেকসই জুতা তৈরি করা। আবার ওয়ালটন সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্যসামগ্রী তৈরি করে ক্রেতা সেবা নিশ্চিত করছে।

২. **কোম্পানির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরকরণ (Setting company objectives and goals):** কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ হলো কোম্পানির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মিশন স্থির করা। কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যা অর্জন করতে চায় তাকে এক কথায় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ কোম্পানিকে বর্তমানে কোথায় আছে আর ভবিষ্যতে কোথায় যেতে চায় তা এধাপে স্থির করা হয়।

কৌশলবিদদের মতে, 'An objective is a statement what is to be achieved" অর্থাৎ যা অর্জন করতে হবে তার একটি বিবৃতিই হলো মিশন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেক্ষিত স্থির করাই মিশন। এক এক কোম্পানির মিশন এক এক রকম হতে পারে। যেমন- কোন প্রতিষ্ঠানের মিশন হতে পারে 'মুনাফা অর্জন নয়, ক্রেতা সেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য'। আবার কোন প্রতিষ্ঠানের মিশন হতে পারে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ।

৩. **ব্যবসায়ের পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ (Analysing the business portfolio):** কোম্পানির মিশন এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করার পর তার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসায় খাতের নকশা প্রণয়ন করতে হয়। উল্লেখ্য, পোর্টফোলিও বলতে কোম্পানির ব্যবসায় ও পণ্যের সমষ্টি বা সমাহারকে বুঝায়। পোর্টফোলিও বিশ্লেষনের জন্য কোম্পানিকে নিম্নোক্ত দু'টি কাজ করতে হয়-

i. **কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট/একক চিহ্নিত করা (Identifying strategic business units):** কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট/একক (Strategic Business Unit) বা সংক্ষেপে SBU বলতে কোম্পানির একটি মাত্র পণ্য, পণ্য লাইন অথবা একটি বিভাগকে বুঝায় যেখানে, প্রত্যেকটি ইউনিটের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ii. **কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট/একক মূল্যায়ন করা (Evaluating strategic business units):** কোম্পানির ব্যবসায় কৌশলগত ইউনিট/একক চিহ্নিতকরণের পর সেগুলো মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়। কৌশলগত ব্যবসায় একক মূল্যায়নের দুইটি জনপ্রিয় পদ্ধতি আছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো:

(ক) দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ অ্যাপ্রোচ (The Boston Consulting Group (BCG) approach): দি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (BCG) হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বর্তমান সময়ের একটি শীর্ষস্থানীয় এবং জনপ্রিয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শমূলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো কৌশলগত ব্যবসায় এককগুলোকে বাজার প্রবৃদ্ধির হার এবং তুলনামূলক শেয়ারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা। বি.সি.জি কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রবৃদ্ধি শেয়ার মেট্রিক্স ব্যবহার করে একটি কোম্পানি তার কৌশলগত ব্যবসায় এককগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। এই মডেলের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার কৌশলগত ব্যবসায় একককে বিভিন্নভাবে ভাগ করতে পারে।

নিচের চিত্রের উলম্ব রেখায় "বাজার প্রবৃদ্ধির হার" এবং ভু-সমান্তরাল রেখায় "তুলনামূলক বাজার শেয়ার" দেখানো হয়েছে। নিচে এরূপ বিষয়গুলো বর্ণনা করা হলো:

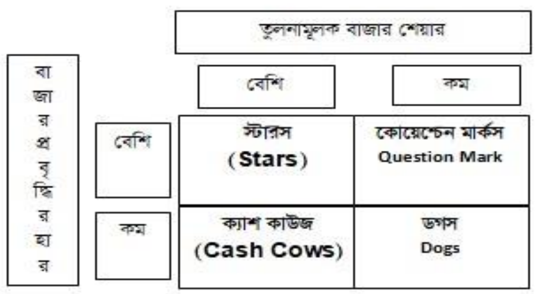

i. **স্টারস (Stars):** স্টারস বলতে ঐ সকল পণ্য বা ব্যবসায় একককে বুঝায় যার বাজার প্রবৃদ্ধির হার বেশি এবং বাজার শেয়ারের পরিমাণ বেশি। এটা ব্যবসায়ের একটা লাভজনক ব্যবসায় একক। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বাজারে এদের বাজার নেতা বলা হয়।

ii. **ক্যাশ কাউজ (Cash Cows):** নিম্ন বাজার প্রবৃদ্ধির হার অথচ তুলনামূলক উচ্চ বাজার শেয়ারসম্পন্ন পণ্য বা ব্যবসায়কে 'ক্যাশ কাউজ' বলা হয়। ক্যাশ কাউজ হচ্ছে তুলনামূলক পরিপক্ক বা পতনশীল শিল্পে নেতৃস্থানীয় কৌশলগত ব্যবসায় একক।

iii. **কোয়েশ্চেন মার্কস (Question mark):** যে সকল পণ্য বা ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধির হার উচ্চ হলেও তুলনামূলক বাজার শেয়ার অত্যন্ত কম তাকে 'কোয়েশ্চেন মার্ক' বলে। কোয়েশ্চেন মার্ক সম্পন্ন ব্যবসায়কে স্টার-এ পরিণত করতে হলে কোম্পানিকে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে।

iv. **ডগস (Dogs):** যে সকল পণ্য বা ব্যবসায় এককের প্রবৃদ্ধির হার খুবই নিম্ন এবং তুলনামূলক বাজার শেয়ারও নিম্ন সে সকল পণ্য বা ব্যবসায় একককে 'ডগস' বলে। এ ব্যবসায় এককে বিনিয়োগ করলেও তেমন একটা লাভ হয়না। তাই বলা যায় ইহা ব্যবসায়ের বিনিয়োগের একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় ইউনিট।

কৌশলগত ব্যবসায় এককসমূহের জন্য গৃহীত কৌশলসমূহ (SBU Strategies): কৌশলগত ব্যবসায় একক বলতে কোম্পানির একটি মাত্র পণ্য, পণ্য লাইন অথবা একটি বিভাগকে বুঝায় যেখানে, প্রত্যেকটি ইউনিটের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য

থাকে। এক্ষেত্রে কোম্পানি তার ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে নিচে উল্লিখিত চারটি কৌশলের যে কোনটি গ্রহণ করতে পারে:

I. **নির্মাণ করা (Build):** বাজার শেয়ার বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। কোয়েশ্চেন মার্ক এককগুলো এ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টার-এ পরিণত হতে পারে।

II. **ধরে রাখা (Hold):** কোম্পানিকে তার বাজার শেয়ার ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ কৌশল 'ক্যাশ কাউ' এর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

III. **ফসল তোলা (Harvest):** যে সকল কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা না করে দ্রুত অথবা যত কম সময়ে সম্ভাব্য বেশি পরিমাণে অর্থ আয় করতে চায় সে সকল কোম্পানির জন্য এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। দুর্বল 'ক্যাশ কাউজ', 'কোয়েশ্চেন মার্ক' অথবা 'ডগস' এর জন্য এ কৌশল অনেক বেশি কার্যকরী।

IV. **পরিহার (Divest):** এ ক্ষেত্রে কোম্পানি তার উৎপাদিত পণ্য অথবা ব্যবসায় একক বিক্রয় করে দিতে পারে বা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কেননা,এই প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। সাধারণত 'কেয়েশ্চন মার্কস' ও 'ডগস্' ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে এ কৌশল গ্রহণ করা হয়।

(খ) দি জেনারেল ইলেকট্রিক অ্যাপ্রোচ (The General Electric Approach): জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি তাদের নাম অনুসারে ব্যবসায় ইউনিট বা একক মূল্যায়নের এ পদ্ধতিটি নামকরন করেছে। এ পদ্ধতিটি G.E. Approach অ্যাপ্রোচ নামেও পরিচিত। পণ্য বা ব্যবসায় পরিচালনা করা, বাজারে প্রবেশ, বাজার ধরে রাখা, বাজার থেকে উঠে আসা প্রভৃতি বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে "কৌশলগত ব্যবসায় পরিকল্পনা গ্রিড' নামে একটি জেনালের ইলেকট্রিক মডেল উপস্থাপন করা হয়। এ মডেলের মাধ্যমে শিল্পের আকর্ষণীয়তা এবং ব্যবসায় শক্তি বিশ্লেষণ করা হয়। নিচের চিত্রে জি.ই. (জেনারেল ইলেকট্রিক) মডেলটি উপস্থাপন করা হলো:

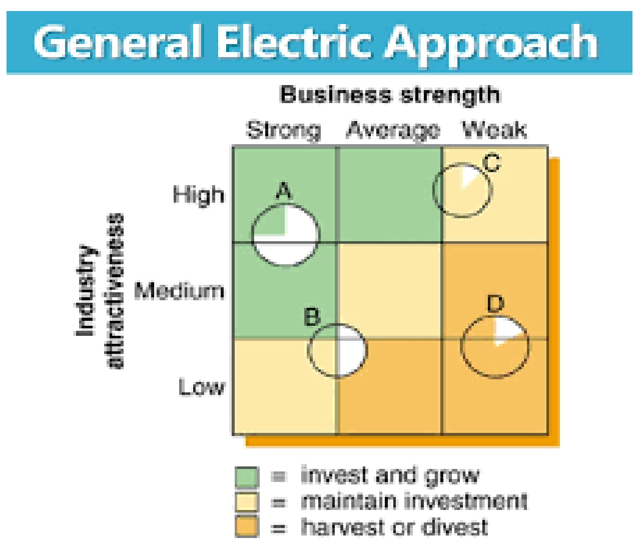

(১) শিল্পের আকর্ষণীয়তা (Industry attractiveness) : এটি এমন একটি অ্যাপ্রোচ যার মাধ্যমে ব্যবসায়ের সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে শিল্পের আকর্ষণীয়তা যাচাই করা হয়। শিল্পের এ আকর্ষনীয়তাকে উচ্চ, মধ্যম এবং দুর্বল-এ তিন ভাগে করা হয়।

(২) ব্যবসায় শক্তি (Business strength): জেনারেল ইলেকট্রিক মডেল-এ কোম্পানির ব্যবসায় শক্তি পরিমাপের জন্য একটি সূচক (Index) ব্যবহার করা হয়। এ সূচককে প্রতিটি ব্যবসায় একককে সবল, মধ্যম এবং দুর্বল-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ব্যবসায় শক্তি পরিমাপে জন্য তুলনামূলক বাজার শেয়ার ব্যবহার করা হয় না।

কৌশলগত ব্যবসায় এককগুলোর জন্য গৃহীত কৌশল (SBU Strategies): কৌশলগত ব্যবসায় পরিকল্পনা গ্রিডকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। তিনটি অঞ্চলেই পৃথক পৃথক কৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

i. **বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধি (Invest and growth):** এরূপ SBU-তে কোম্পানির অবস্থান অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং শক্তিশালী। এরূপ ব্যবসায় এককগুলোতে অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন।

ii. **বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা (Maintain Investment):** এরূপ এস.বি.ইউ. (SBU)-তে কোম্পানির অবস্থান মধ্যম মানের। অর্থাৎ এরূপ ব্যবসায় এককের আকর্ষণীয়তা এবং ব্যবসায় শক্তি মাঝামাঝি প্রকৃতির। এসব ব্যবসায় ইউনিটে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হয়।

iii. **ঘরে তোলা বা বিনিয়োগ প্রত্যাহার (Harvest or divest):** এরূপ এস.বি.ইউ (SBU)-এর অবস্থান নিম্নমানের। অর্থাৎ এরূপ ব্যবসায় এককের আকর্ষণীয়তা খুবই দুর্বল। এ ক্ষেত্রে কোম্পানি ইচ্ছে করলে বিনিয়োগ বন্ধ করে দিতে পারে অথবা ব্যবসায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৪. **বাজারজাতকরণ কার্যাবলীর পরিকল্পনা (Marketing Acitivities Planning):** এই পর্যায়ে এসে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ ও সময়সীমার কথা মাথায় রেখে যথাযথ বিপণন মিশ্রণ নির্ধারণ করে পণ্য, মূল্য, যোগাযোগ ও বণ্টন কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে বাজেট পর্যালোচনা করে বিপণনের বিভিন্ন কার্যাবলীর কর্মক্ষমতা এবং বাজারের অবস্থার বিকাশ বিবেচনা করতে হয় এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং টেকসই সাফল্য নিশ্চিত করতে সময়মত প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হয়।

কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্ব

Importance of Strategic Planning

কৌশলগত পরিকল্পনা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সেই সাথে পরিবর্তনশীল বিপণনের সুযোগসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করা। কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্যও নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠান তার সবলতা ও দূর্বলতা পরিমাপ করা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সামর্থ্য হয়। কাজেই বলা যায় যে, কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১. **সুযোগ ও হুমকি চিহ্নিত করণ (identifying opportunities and threats) ঃ** কৌশলগত বিপণনের মাধ্যমে সুযোগ ও হুমকিগুলো চিহ্নিত করা যায়। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সমজাতীয় বা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহের পর সেগুলো যাচাই-বাছাই করা হয় বিধায় নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ ও হুমকিগুলো চিহ্নিত করা যায়।

২. **সবলতা ও দুর্বলতা পরিমাপ (Assessing strengths and weaknesses) ঃ** SWOT বিশ্লেষণ থেকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সবলতা ও দূর্বলতা পরিমাপ করা যায়। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে প্রতিযোগীদের সবলতা ও দুর্বলতা পরিমাপ করা যায়।

৩. **কোম্পানির মিশন সংজ্ঞায়ন (Defining the company mission) ঃ** প্রতিষ্ঠানকে তার সফলতার জন্য মিশন স্থির করতে হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কোথায় আছে আর কোথায় পৌঁছতে চায় আর প্রতিষ্ঠানের মিশন কি স্থির করা হবে, এসব মূলত পণ্য ও সেবা বিপণনের উপর নির্ভর করে।

৪. **গ্যাপ চিহ্নিতকরণ ও পূরণ (Identifying and filling gaps) ঃ** অলাভজনক বিপণনের কৌশলগত পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গ্যাপ চিহ্নিতকরণ ও তা পূরণ করা। এজন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমাপ করা হয়।

৫. **উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ (Determining objectives and methods) ঃ** যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার সফলতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে উদ্ধেশ্য ও পদ্ধতি কাজ করে থাকে। কৌশলগত পরিকল্পনায় এ উদ্দেশ্যের একটা সাধারণ বিবৃতি থাকে।

৬. **দিক-নির্দেশনা প্রদান (Providing gudelines)** ঃ কৌশলগত পরিকল্পনা সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে ভূমিকা রাখে। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশেও কৌশলগত পরিকল্পনা দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৭. **ব্যবসায় খাত নির্ধারণ (Determining business portfolio)** ঃ প্রতিষ্ঠান কোন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক লাভবান হবে তা ব্যবসায় খাত নির্ধারণের মাধ্যমে যাচাই করতে পারে। অর্থাৎ কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগের সবল ও দূর্বল দিক গুলো ঠিক করা যায়। কৌশলগত ব্যবসায় একক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে বিনিয়োগ যোগ্য খাতটি চিহ্নিত করা সহজ হয়।

৮. **ব্যবসায় একক নির্ধারণ (Determining business Unit)** ঃ বিপণন ব্যবস্থাপনার একেকটি খাত একেক রকম হয়। আর এই সকল খাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে হয়। কৌশলগত পরিকল্পনা এই সকল ব্যবসায় একক নির্ধারণ ও তাতে কৌশল গ্রহণে সহায়তা করে।

৯. **ব্যবসায় একক বিশ্লেষণ (Analyzing business unit)** ঃ ব্যবসায় একক নির্ধারণের পর তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে নাকি প্রত্যাহার করা হবে। ব্যবসায় একক বিশ্লেষণের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনার দুইটি প্রচলিত পদ্ধতি (বিসিজি এবং জিই অ্যাপ্রোচ) ব্যবহার করা হয়।

১০. **সমস্যার পূর্বানুমান (To anticipate problems)** ঃ কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রমগুলোর পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করা হয়। যার ফলে কোন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হলে তা পূর্ব থেকেই অনুমান করা যায়। এভাবেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যার পূর্বানুমান করা যায়।

১১. **দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Making rapid and accurate decision)** ঃ বিপণন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবর্তিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে বাজারজাতকারীকে তার প্রতিষ্ঠানের কাজ চালিয়ে নিতে হয়। কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে সহজেই এই কাজটি সম্পাদন করা যায়।

১২. **প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণ (Growth analysis)** ঃ প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ হলো মূলত ব্যবসায়ের বিক্রয় ও মুনাফার শতকরা পরিমাণ নির্ধারণ। বিগত কয়েক বছরের বাজার প্রবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কোম্পানি তার বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাজারজাতকরণে কৌশলগত পরিকল্পনার যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে। উপরে উল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও কৌশলগত পরিকল্পনা ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জন, মডেল ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে থাকে।

কর্পোরেট কৌশল, ব্যবসায় কৌশল ও বিপণন কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক/পার্থক্য

Relationship/Distinction between Corporate, Business Strategy and Marketing Strategy

মূল কোম্পানির উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অধঃস্তন ব্যবস্থাপকের জন্য ব্যবসায় পরিচালনার যে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল নির্ধারণ করা হয় তাকে কর্পোরেট কৌশল (Corporate Strategy) বলে। অন্যদিকে, উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায় ইউনিটের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কৌশলকে ব্যবসায় কৌশল (Business Strategy) বলে। পক্ষান্তরে, পণ্য বিপণের ক্ষেত্রে কখন, কোথায় এবং কিভাবে

প্রতিযোগিতা করা হবে সে সম্পর্কিত উচ্চ ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তের ভিত্তিকে বিপণন কৌশল (Marketing Strategy) বলে।

কর্পোরেট কৌশল, ব্যবসায় কৌশল এবং বিপণন কৌশলের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বিদ্যমান। আবার এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কের বিষয়টি চিত্রে মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

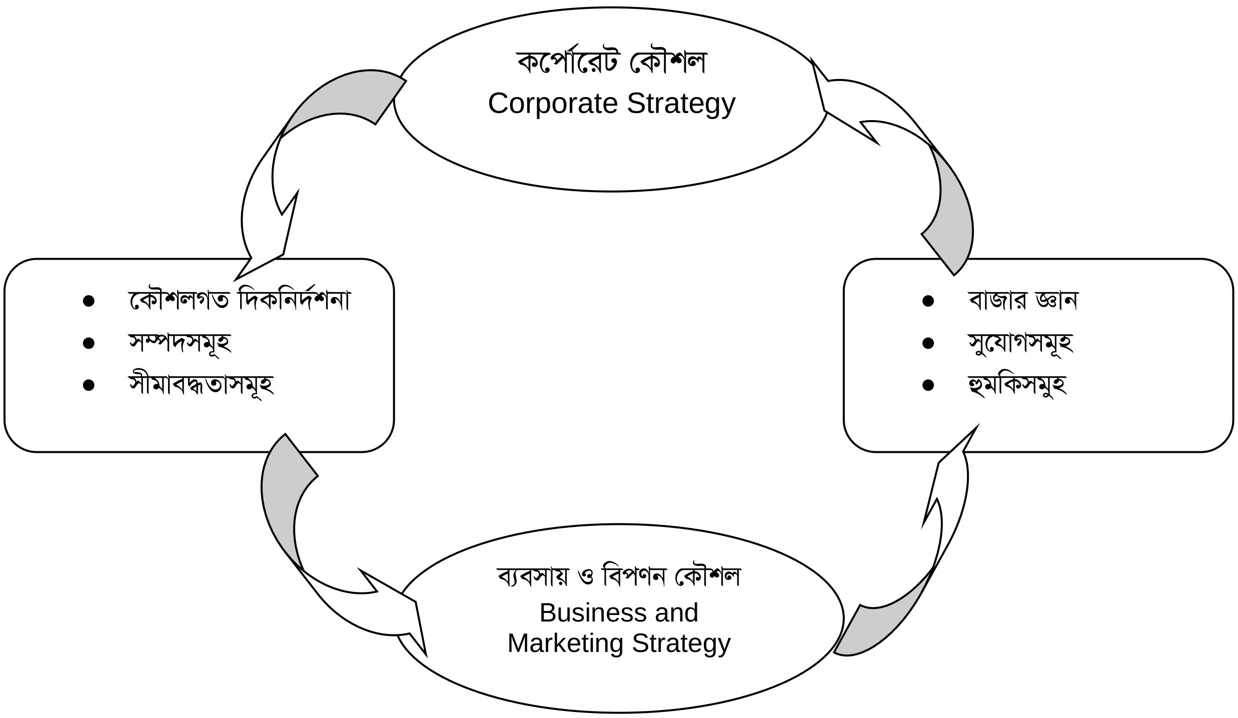

চিত্র ঃ কর্পোরেট, ব্যবসায় ও বাজারজাতকরণ কৌশল

কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত হয় কর্পোরেট পর্যায়ে। অন্যদিকে, ব্যবসায় কৌশলে অনুসরণের মাধ্যমে কর্পোরেট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ব্যবসায় কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজন হয় বিপণন কৌশল। যার মাধ্যমে ক্রেতা ভ্যালুর সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এক কথায় বলতে গেলে কর্পোরেট কৌশলের ভিত্তিতে ব্যবসায় কৌশল উন্নয়ন করা হয়। আর বিপণন কৌশল গৃহীত হয় কর্পোরেট কৌশল এবং ব্যবসায় কৌশলের নির্দেশনা ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, তিনটি কৌশলই একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং প্রত্যেকটি কৌশলই একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। কারন কর্পোরেট কৌশলের সামান্য ভুল ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এনে দিতে পারে। আবার বিপণন কৌশলের ফল নেতিবাচক হতে পারে। কাজেই বলা যায় যে, কর্পোরেট কৌশল ও ব্যবসায় এবং বিপণন কৌশলের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের মধ্যকার কিছু পার্থক্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. কর্পোরেট কৌশলগ অত্যন্ত জটিল ও সুসমন্বিত কার্যক্রম এবং এর উপর ভিত্তি করে বাজারজাতকারীরা ব্যবসায় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অন্যদিকে, ব্যবসায় এবং বিপণন কৌশল তুলনামূলক সহজ এবং যা মূলত ক্রেতা ভ্যালু ও মুনাফাযাগ্য ক্রেতা ভ্যালু সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

২. কর্পোরেট কৌশলের আওতা অনেক ব্যাপক। অন্যদিকে, ব্যবসায় ও বিপণন কৌশলের আওতা অপেক্ষাকৃত সীমিত।

৩. কর্পোরেট কৌশল মূলত স্বাধীন। অর্থাৎ এটি ব্যবসায় ও বিপণন কৌশলের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কর্পোরেট কৌশলের উপর ব্যবসায় ও বিপণন কৌশল নির্ভরশীল।

৪. কর্পোরেট কৌশল প্রণয়ন করে কোম্পানির শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ। অন্যদিকে, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকরা ব্যবসায় ও বিপণন কৌশল প্রণয়ন করে।

৫. কর্পোরেট কৌশল ব্যবসায় ও বিপণন কৌশলের জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা, সম্পদ বণ্টন এবং সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে দেয়। অন্যদিকে, ব্যবসায় ও বিপণন কৌশল বাজার জ্ঞান, সুযোগ ও হুমকি সম্পর্কে কর্পোরেট কৌশলকে ধারণ দেয়।

৬. মাঠ পর্যায়ে কর্পোরেট কৌশলের প্রয়োগ কম। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে ব্যবসায় ও বিপণন কৌশলের প্রয়োগ কর্পোরেট কৌশলের চেয়ে বেশি।

৭. কর্পোরেট কৌশলের অধীনে কোম্পানির ব্যবসায় ও বিপণন কৌশল প্রণীত হয়। কিন্তু ব্যবসায় ও বিপণন কৌশলের অধীনে কর্পোরেট কৌশল প্রণীত হয় না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, কর্পোরেট কৌশলের সাথে ব্যবসায় এবং বিপণন কৌশলের নিবিড় সম্পর্ক আছে, তেমনি কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

কৌশলগত পরিকল্পনা হলো বিপণন সংক্রান্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার মাধ্যমে বাজারের ভবিষ্যতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগসমূহ গ্রহণ করা হয়। কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নে কোম্পানিকে কতকগুলো স্তর বা পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন-কোম্পানীর মিশণ সংজ্ঞায়িতকরণ, কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরকরণ, ব্যবসায়ের পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ এবং বিপণন কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রণয়ণ। কৌশলগত পরিকল্পনা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সেই সাথে পরিবর্তনশীল বিপণনের সুযোগসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করা। কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্যও নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠান তার সবলতা ও দূর্বলতা পরিমাপ করা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সমর্থ হয়। কাজেই বলা যায় যে, কৌশলগত পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারজাতকরণে কৌশলগত পরিকল্পনার যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে। উপরে উল্লিখিত কাজগুলো ছাড়াও কৌশলগত পরিকল্পনা কোম্পানীর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জন, মডেল ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে থাকে।

পাঠ-২.৫

বাজারে অবস্থান গ্রহণের সংজ্ঞা ও বাজারে অবস্থান গ্রহণের কৌশলসমূহ

Market Positioning Strategy and Considering Factors in Strategic Market Positioning Analysis

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাজারে অবস্থান গ্রহণ এর সংজ্ঞা জানতে পারবেন
- কৌশলগত **বাজার** অবস্থান বিশ্লেষণে বিবেচ্য উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

বাজারে অবস্থান গ্রহণ কৌশল

Market Positioning Strategy

সাধারণ অর্থে, অবস্থান গ্রহণ বলতে কোন একটা জায়গায় স্থান করে নেয়াকে বুঝায়। বিপণনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার তুলনায় ক্রেতাদের মনের ভিতরে কোন একটি পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ বা স্বতন্ত্র জায়গা দখল করে নেয়াকেই বাজারে অবস্থান গ্রহণ বলে। যেমন-'সনি টিভি মানেই ভালো টিভি'- ক্রেতার মনে এ ধারণা দীর্ঘদিন টিকে আছে। আর বাজারজাতকরণে এ ধারণাই হলো বাজারে অবস্থান গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে তুলে ধরা হলো:

Philip Kotler & Gary Armstrong এর মতে, "Market positioning is arranging for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the mind of target consumers." অর্থাৎ, বাজারে অবস্থান গ্রহণ হচ্ছে অভীষ্ট ক্রেতাসাধারণের জন্যে প্রতিযোগী পণ্যের তুলনায় একটি পণ্যের সু-স্পষ্ট, স্বতন্ত্র এবং কাঙ্খিত স্থান দখল করার ব্যবস্থাকরণ।

Perreault & McCarthy বলেন, "Positioning show where customers locate proposed and/or present brands in a market." অর্থাৎ ক্রেতারা কিভাবে প্রস্তাবিত অথবা বর্তমান ব্র্যান্ডকে বাজারে অবস্থান দেয় তা নির্দেশ করাই অবস্থান গ্রহণ।

Zikmund & D'Amico এর ভাষায়, "Positioning is the planning of the market position the company wishes to occupy." অর্থাৎ কোম্পানি অর্জন করতে ইচ্ছুক এরূপ বাজার অবস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনাই হলো অবস্থান গ্রহণ।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বাজারে অবস্থান অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো-

- ✓ পণ্য বা সেবা সম্পর্কে ক্রেতাদের মনে স্থান দখল করে নেয়াকে অবস্থান গ্রহণ বলে।
- ✓ পণ্যের অবস্থান গ্রহণ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করে।
- ✓ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রেতারা পণ্যের অবস্থান গ্রহণের ভিত্তিতে পণ্য ক্রয় করে থাকে।
- ✓ মানসম্পন্ন পণ্য বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সহজে ক্রেতাদের মনের ভিতরে প্রবেশ করা যায়।
- ✓ ক্রেতার মনে স্থান দখল করতে পারলে তারা নিয়মিতভাবে পণ্য ক্রয় করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাজারে অবস্থান গ্রহণ হচ্ছে প্রতিযোগীর তুলনায় ভোক্তাদের মনে কোন পণ্যের স্বতন্ত্র ধারণা সৃষ্টি যা ভোক্তা তার মনের ভিতর ধারণ করে।

কৌশলগত বাজার অবস্থান বিশ্লেষণে বিবেচ্য উপাদানসমূহ

Considering Factors in Strategic Market Positioning Analysis

সাধারণ অর্থে, বাজারজাতকরণে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার তুলনায় ক্রেতাদের মনের ভিতরে কোন একটি পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ বা স্বতন্ত্র জায়গা দখল করে নেয়াকেই বাজারে অবস্থান গ্রহণ বলে। উপযোগী পণ্যের তুলনায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পণ্যটি ক্রেতার মনে যে অবস্থান দখল করে তাকে বলা হয় কৌশলগত অবস্থান। নিচে কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণে বিবেচ্য উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **প্রতিযোগী বিশ্লেষণ (Competitor Analysis):** যারা সমজাতীয় বা বিকল্প পণ্য নিয়ে ব্যবসায় করেন তাদেরকে প্রতিযোগী বলা হয়। কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একজন প্রতিযোগী একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্যকে কিভাবে প্রত্যক্ষণ বা মূল্যায়ন করে থাকে তা নিরূপণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিযোগী পণ্যের কোন কোন গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় করেন তা খেয়াল করতে হয়।

২. **প্রতিযোগী চিহ্নিতকরণ (Competitor identification):** প্রতিযোগী চিহ্নিতকরণ হলো কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণের অপর একটি ধাপ। এই ধাপে দুই ধরনের প্রতিযোগী দেখতে পাওয়া যায়। যথা:
   i. প্রাথমিক প্রতিযোগী যারা মূলত একই ধরণের পণ্য বা সেবার উৎপাদন করে থাকে।
   ii. মাধ্যমিক প্রতিযোগী যারা অন্যান্য শ্রেণির পণ্য উৎপাদন করে থাকে।

কোম্পানির কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণের এ স্তরে কোম্পানির মূল প্রতিয়োগীরা সমজাতীয় পণ্য নিয়ে ব্যবসা করছেন নাকি বিকল্প পণ্যের বিপণনের সাথে জড়িত তা চিহ্নিত করা হয়।

৩. **প্রতিযোগীদের অবস্থান নির্ধারণ (Determine the position of competitors):** প্রতিযোগী চিহ্কিরণের পর এ পর্যায়ে বাজারে প্রতিতেযোগীদের অবস্থান কোথায় আছে তা নিরূপণ করে। এর মধ্য দিয়ে একটি কোম্পানি তার ব্র্যান্ড এবং অন্যান্য প্রতিযোগী কোম্পানির ব্র্যান্ডের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এর ফলে প্রতিযোগী সম্পর্কিত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

৪. **অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত (Decision to accept the position):** কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণের সময় অবস্থান গ্রহণ সিদ্ধান্ত অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ ধাপে বাকি ধাপগুলো অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করার পর যে নির্দেশনার মাধ্যমে অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা হলো:
   i. অবস্থান গ্রহণ সাধারণভাবেই বাজার বিভক্তিকরণের উপর নির্ভরশীল।
   ii. ইহা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে।
   iii. অবস্থান গ্রহণ কৌশল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্নকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

৫. **বাজার অবস্থান গ্রহণের কৌশল (Strategy for Market Positioning):** উপযোগী পণ্যের তুলনায় কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যটি ক্রেতার মনে যে অবস্থান দখল করে তাকে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ বলে। ক্রেতার মনে অবস্থান গ্রহণের জন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাজারে অবস্থান গ্রহণের বিভিন্ন বিকল্প কৌশলসমূহ হলো:
   i. **পণ্যের ব্যবহার ভিত্তিক কৌশল:** পণ্যের ব্যবহার ভিত্তিক কৌশল প্রমোট করার মাধ্যমে বাজারে অবস্থান করা যায়। যেমন-'ঠান্ডা পানিতে ট্যাং'।
   ii. **পণ্যের প্রতিযোগীর ক্ষেত্রে কৌশলসমূহ:** এ কৌশলে পণ্যকে প্রতিযোগী পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে ক্রেতার মনে অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়। যেমন- 'সাধারণ সাবানের চেয়ে ১০ গুণ সাশ্রয়ী সাবান'।
   iii. **পণ্যের বৈশিষ্ট্যভিত্তিক কৌশল:** এ কৌশলে পণ্যকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে ক্রেতার মনে অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়। যেমন- সনি টিভি মানেই ঝক্‌ঝকে ছবি।

iv. **পণ্যের উপকার নির্ভরতার কৌশল:** এ কৌশলে পণ্যের ব্যবহার উপযোগিতার সুবিধা প্রদান করে ক্রেতার মনে অনুকূল ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়। যেমন- মেডিপ্লাস টুথপেস্ট দাঁতের শিরশিরভাব রোধ ও ক্ষয় রোধ করে।

৬. ক্রেতা বিশ্লেষণ (Buyer Analytics) : এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট বাজারে একজন ক্রেতার অভ্যাস এবং আচরণ কেমন হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়। ক্রেতা এবং বাজার সম্পর্কে জানার জন্য যা দরকার তা হলো:

i. ক্রেতাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পণ্য কি ভূমিকা পালন করে। যদিও এ ধরনের বিভক্তিকরণ বা পার্থক্য নিরূপণ করা একটি জটিল প্রক্রিয়া।
ii. বাজার কীভাবে বিভক্তিকরণ করা হয় তা বিবেচনা করা।
iii. ক্রেতারা পণ্যের প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ করে তা বিবেচনা করতে হয়।

৭. ক্রেতা ও প্রতিযোগী গবেষণা (Buyer and Competitor Research): প্রতিযোগী কোম্পানির তুলনায় নিজ পণ্যের অবস্থান সৃষ্টির জন্য বাজারজাতকারীকে নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হয়। আর তার জন্য ক্রেতা ও প্রতিযোগীর গবেষণা করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিযোগী পণ্যের ক্রেতারা সম্ভাব্য পণ্যকে কীভাবে দেখছে তা এ স্তরে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে আরো যা বিবেচনা করা হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

i. বিক্রয় কর্মীদের জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে কী-না
ii. বিক্রয় কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে কী-না
iii. প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও অপারেটিং সুপারভাইজারকে পণ্য সম্পর্কে অবগত করা।

৮. বাজার যাচাইকরণ (Market validation): কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে বাজার যাচাইকরণ করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের নতুন পণ্যের সম্ভাব্য বাজার যাচাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করার পর সেগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজার যাচাই করা যায়। আর গবেষণা পদ্ধতির ওপর বিপণন কর্মসূচির উপাদানগুলো প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর বাজারের আয়তন এবং বাজারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে থাকে বাজার যাচাইয়ের খরচসমূহ। এক্ষেত্রে বাজার যাচাই বাজার সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পনীর কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগী বিশ্লেষণ, প্রতিযোগী চিহ্নিতকরণ, প্রতিযোগীদের অবস্থান নির্ধারণ, অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত, বাজার অবস্থান গ্রহণের কৌশল, ক্রেতা বিশ্লেষণ, ক্রেতা ও প্রতিযোগী গবেষণা ও বাজার যাচাইকরণের মতো নির্ধারক বিবেচনা করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

অবস্থান গ্রহণ বলতে কোন একটা জায়গায় স্থান করে নেয়াকে বুঝায়। বিপণনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার তুলনায় ক্রেতাদের মনের ভিতরে কোন একটি পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র জায়গা দখল করে নেয়াকেই বাজারে অবস্থান গ্রহণ বলে। অর্থাৎ বাজারে অবস্থান গ্রহণ হচ্ছে প্রতিযোগীর তুলনায় ভোক্তাদের মনে কোন পণ্যের স্বতন্ত্র ধারণা সৃষ্টি যা ভোক্তা তার মনের ভিতর ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগী পণ্যের তুলনায় নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পণ্যটি ক্রেতার মনে যে অবস্থান দখল করে তাকে বলা হয় কৌশলগত অবস্থান। কোম্পানীর কৌশলগত অবস্থান বিশ্লেষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগী বিশ্লেষণ, প্রতিযোগী চিহ্নিতকরণ, প্রতিযোগীদের অবস্থান নির্ধারণ, অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত, বাজার অবস্থান গ্রহণের কৌশল, ক্রেতা বিশ্লেষণ, ক্রেতা ও প্রতিযোগী গবেষণা ও বাজার যাচাইকরণের মতো নির্ধারক বিবেচনা করা হয়।

পাঠ-২.৬ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Considering Factors of Strategy Implementation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন
- বাংলাদেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা জানতে পারবেন

কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Considering Factors of Strategy Implementation

কৌশল বাস্তবায়ন হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোম্পানির উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ। এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনা করতে হয়, যা নীচে আলোচনা করা হলো:

১. **সম্পদ ও সার্মথ্য (Resources and Capabilities):** কৌশল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য কেমন আছে, কৌশল বাস্তবায়নে তা বিবেচনা করা উচিত।

২. **সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Setting the right objectives):** কৌশল সাধারণত কোন নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত হয়ে থাকে। কি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৌশল প্রণীত হয়েছে, কৌশল বাস্তবায়নে তা বিবেচনা করতে হবে।

৩. **আচরণিক দিক (Behavioral aspect):** কৌশল দ্বারা যদি কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে কৌশল বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কর্মীদের আচরণিক দিকটি বিবেচনা করা উচিত।

৪. **পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি (Changing situation):** সাধারন কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কৌশল গৃহীত হয়। পরিস্থিতি সর্বদা স্থির থাকে না। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে কৌশল বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই কৌশল বাস্তবায়নে এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

৫. কর্মীদের মনোভাব **(Employees’ attitude):** কর্মীরা সাধারণত সব সময় পরিবর্তনশীল কর্মপন্থা পছন্দ করে না। কৌশল বাস্তবায়নে নির্ভর করে কর্মীদের মনোভাবের উপর। কাজেই এ দিকটি বিবেচনা করা উচিত।

৬. **কর্ম পরিবেশ (Working environment):** কৌশল বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশের উপর। কাজেই প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবশে কেমন তা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, কৌশল প্রণয়ন করা হয় কোন পরিবর্তনমীল পরিস্থিতির সাথে খাওয়ানোর জন্য। কৌশল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যাও রয়েছে। তাই কৌশল বাস্তবায়নে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

বাংলাদেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা
Problems for Preparation and Implementation of Strategy in Bangladesh

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন বেশ জটিল কাজ। আর্থিক সামর্থ্য,

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারি নীতি ও পলিসি ইত্যাদি বিবেচনায় কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। নিচে বাংলাদেশে বিপণন কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **দুর্বল ব্যবস্থাপনা (Weak Management) :** আমাদের দেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দুর্বল ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী। ব্যবস্থাপনা কাঠামো কৌশল বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের কারণেও এমনটি ঘটে থাকে। যা কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে।

২. **সরকার পরিবর্তন (Changes in Government) :** সরকার পরিবর্তন বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের রাজনীতির একটি অন্যতম বেশিষ্ট্য। এক সরকারের নীতি ও কৌশল নতুন সরকার গ্রহণ করতে চায় না। ফলে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে সরকারী নীতি ও কৌশল গুলো পরিবর্তন হয়। যার কারনে আমাদরে দেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য।

৩. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা (Bureaucratic complexity) :** আমলা তান্ত্রিক জটিলতা আমাদের দেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা। এই প্রশাসনিক জটিলতার কারনে সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়গুলোতে সঠিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক বলয়ের কারণে কর্মকর্তারাও ঠিক মতো কাজ করতে পারে না যা কৌশল বাস্তবায়নের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪. **রাজনৈতিক অস্থিরতা (Political Instalitity) :** রাজনৈতিক অস্তিরতা আমাদের দেশের পোশাক শিল্পের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের বিরোধী দল যারা থাকেন তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করেন। যার ফলে রাজনৈতিক পরিবেশে অস্থিরতা বিরাজ করে। যার কারণে পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

৫. **শ্রমিক সংঘের প্রভাব (Effect of Labour Union) :** কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ সমস্যা হলো শ্রমিক সংঘের প্রভাব। অনেক সময় শ্রমিক সংঘগুলো কৌশল বাস্তবায়নে বিরোধিতা ও বিরূপ আচরণ প্রদর্শণ করে। রাজনৈতিক দলের সাথে শ্রমিক সংঘের একটা বৃহৎ অংশের সম্পৃক্ততা থেকেও কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৬. **তথ্য পাচার (Information Disclose) :** পোশাক শিল্পের তথ্য পাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ এদেশের শিল্প কলকারখানাসহ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে তথ্য নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে কৌশল সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। এতে কৌশল বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।

৭. **প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব (Lack of Logistics) :** যে কোনা ধরনের কৌশল বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত বা উপাদান হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করা। কারণ সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে পণ্য সরবরাহ ঠিকমতো না হলে কৌশল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আর এই সরবরাহের অভাবের কারণেই বাংলাদেশে সঠিকভাবে কৌশল বাস্তবায়নের বাঁধা সৃষ্টি হয়।

৮. **অদক্ষ মানব সম্পদ (Inefficient Human Resources) :** আমাদের দেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হলো অদক্ষ মানব সম্পদ। কৌশল বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমান দক্ষ মানব সম্পদ থাকা প্রয়োজন তা আমাদের দেশে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে কৌশল বাস্তবায়ন যথার্থ হয় না।

৯. **যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব (Lack of modernization of machineries) :** আমাদের দেশে কৌশল

প্রণয়নের আরেকটি সমস্যা হলো আধুনিক যন্তপাতি বা যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব। অনেক কৌশল আছে যেগুলোর প্রয়োগ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। আর তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার। আধুনিক যন্তপাতির অভাবে কৌশল প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ আমাদের দেশে যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের বিষয়টি তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরের আলোচিত সমস্যাগুলো আমাদের দেশে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তববায়নের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেগুলোর সমাধান করতে না পারলে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয় । তাই কৌশল প্রণয়ণের সময়ই এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বিপণনে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার তুলনায় ক্রেতাদের মনের ভিতরে কোন একটি পণ্য বা ব্র্যান্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র জায়গা দখল করে নেয়াকেই বাজারে অবস্থান গ্রহণ বলে। অর্থাৎ বাজারে অবস্থান গ্রহণ হচ্ছে প্রতিযোগীর তুলনায় ভোক্তাদের মনে কোন পণ্যের স্বতন্ত্র ধারণা সৃষ্টি যা ভোক্তা তার মনের ভিতর ধারণ করে। কৌশল বাস্তবায়ন হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোম্পানির উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রণীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ। এক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনা করতে হয় যেমন সম্পদ ও সার্মথ্য, সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ, আচরণিক দিক, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, কর্মীদের মনোভাব, কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি। কৌশল প্রণয়ন করা হয় কোন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য। কৌশল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যাও রয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন বেশ জটিল কাজ। আর্থিক সামর্থ্য, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারি নীতি ও পলিসি ইত্যাদি বিবেচনায় কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দ্রুত সরকার পরিবর্তন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক সংঘের প্রভাব,তথ্য পাচার, প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব, অদক্ষ মানব সম্পদের অভাব, যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব ইত্যাদি তো আছেই। তাই কৌশল বাস্তবায়নে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. কর্পোরেট কৌশল বলতে কী বোঝায়?
২. ব্যবসায় কৌশল বলতে কী বোঝায়?
৩. বিপণন কৌশল বলতে কী বোঝায়?
৪. কর্পোরেট কৌশল ও ব্যবসায় এবং বিপণন কৌশলের সম্পর্ক দেখান।
৫. কর্পোরেট কৌশল ও ব্যবসায় এবং বিপণন কৌশলের পার্থক্য লিখুন।
৬. কৌশলগত বিপণন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৭. বিপণন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৮. ব্যবসায় কৌশল প্রণনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়/উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
৯. বাজাজরাতকরণ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
১০. কৌশলগত বাজারজাতকরণ পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
১১. কৌশলগত বিপণন পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।
১২. কৌশলগত বাজাজরাতকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ্ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

তথ্যসূত্র:

Cravens, D. W., & Piercy, N. F. (2008). Strategic Marketing (9th Edition). McGraw-Hill Education, Irwin.
Porter, M. E. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, NY.
Walker, O. C. , Boyd, H. W., & Larréché, J-C. (1992). Marketing Strategy: Planning and Implementation. Richard d Irwin.
Barney, J. B., & Griffin, R. W. (1992).The Management of Organizations: Strategy, Structure, Behavior. Houghton Mifflin (Academic).
Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (1996). Basic marketing: a global-managerial approach. Irwin.
Miles, R. E., & Snow, C. C. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford Business Classics.
Zikmund, W. G., & D'Amico, M. (1993). Business & Economics. West Publishing Company.